বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালির রাষ্ট্র-জাতি ... তনা - নূহ.উল.আলম লেনিন

'... আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ...।'

- বঙ্গবন্ধু, ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিনটি আমাদের বিজয় দিবস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির আগে পর্যন্ত বাঙালিরা নিজেদেরকে পূর্ণ বিজয়ী হিসেবে ভাবতে পারেনি। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশের মাটিতে পা রাখার পরেই যেন মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সম্পূর্ণ হলো। জাতির ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরববোধ বিসর্জন না দিলে, যে দলের সরকারই হোক না কেন বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের

এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় রাষ্ট্রীয় উৎসব হিসেবে পালন করতো।

দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস তো দূরের কথা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তার নামটুকু পর্যন্ত উচ্চারণ করে না তারই আজীবনের সংগ্রামের ফল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধারগণ। ইতিহাসের খলনায়ক জিয়াউর রহমানকে শেখ মুজিবের স্থলাভিষিক্ত করার হাস্যকর প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত বিএনপি এবং দক্ষিণপন্থি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের লেজেটিমেসিকেই অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে আছে। শেখ মুজিবকে অস্বীকার করতে গিয়ে তারা কার্যত 'জাতি'কে, বাঙালি জাতি পরিচয়কে রাষ্ট্রপরিচয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে। রাষ্ট্র ও জাতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির একটা ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে তারা সক্ষম হয়েছে। অর্থহীন করে তুলেছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মদান।

বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন ও ট্র্যাজেডির নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতির ইতিহাসের প্রথম জাতি.রাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে অন্য সকল বাঙালি রাজনৈতিক নেতার ওপরে তাঁর স্থান। কেবল এই একটি কারণেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি.এরকম একটা অতি সরলীকৃত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। দৃশ্যত কথাটা সত্য। কিন্তু আমার বিবেচনায় রাষ্ট্রচিন্তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে 'জাতি.চেতনা' বঙ্গবন্ধুর মতো আর কেউ এতটা সুস্পষ্টভাবে তা উচ্চারণ করেননি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বে বাঙালি জাতির-বাংলাভাষার স্বাতন্ত্র্য, পরিচয় ও গৌরব প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ষোলআনা বাঙালি হয়েও, প্রচলিত অর্থে জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। অতুলনীয় দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ একাধারে 'ভারত.পথিক' ও 'বিশ্ব.পথিক'। তাঁর মধ্যে ছিল 'মহাজাতি' চেতনা। বাঙালির জন্য পৃথক রাষ্ট্র.চিন্তা যেমন তাঁর ছিল না, তেমনি বাঙালির জাতীয়তাবোধকে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে সংশ্লেষিত করেছেন। দেশভাগের আগে বিশেষ করে জিন্নাহর দ্বি.জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে 'পাকিস্তান আন্দোলনের' পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু.মুসলমান নির্বিশেষে সকল বঙ্গদেশীয়/ভারতীয় রাজনীতিবিদ, কবি, শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিকের রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয়তাবোধ মোটামুটি সর্বভারতীয়ই ছিল।

প্রধানমন্ত্রী হন এবং শেষ মুহূর্তে দেশভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। যে রাষ্ট্রচেতনা থেকে কংগ্রেস নেতা কিরণ শঙ্কর রায় এবং নেতাজী সুভাষ বসুর বড় ভাই শরৎ বসু বাংলাভাগের বিরোধিতা করেন তাদের সে চেতনা তথা জাতীয়তাবোধ ততটা পরিচ্ছন্ন ছিল না। পক্ষান্তরে সোহরাওয়ার্দী কখনোই সুস্পষ্টভাবে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি। মাত্র কিছুদিন আগে মুসলিম লীগের দিল্লি অধিবেশনে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী আনেন। পরে অবশ্য তিনি বাংলাভাগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এমনকি কার্যকর হবে না জেনে বুদ্ধিমান জিন্নাহ বাংলাভাগ না করে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবে সায় দেন। কিন্তু শরৎ বসু.সোহরাওয়ার্দীর এই বিলম্বিত উদ্যোগ সা¤প্রদায়িক ভেদ.বুদ্ধির প্রবল জোয়ার ঠেকাতে পারেনি। শরৎ বসু.সোহরাওয়ার্দী তাদের রাষ্ট্রচিন্তা সুস্পষ্ট করতে সক্ষম হলেও 'জাতি' সম্পর্কিত কোনও সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরতে পারেননি। হিন্দু.মুসলমানের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক মিলিত রাষ্ট্র হলেই যে তার অভিন্ন জাতীয়তাবোধ থাকবে, এমনটি নয়।

বাঙালি মুসলমানের মধ্যে রাষ্ট্র ও জাতি চেতনায় কখনোই একমুখীনতা ছিল না। রাষ্ট্রের ভিন্নতার বিষয়টি অনেক পরে মূর্ত নির্দিষ্ট রূপ নেয়। তবে মোটাদাগে জাতীয়তাবাদের দু'টি প্রবণতা অসা¤প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম সা¤প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ সমাজ ও রাজনীতিতে উনিশ শতকে থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। এর পরিণতি আমাদের জানা।

বর্তমান বাংলাদেশ ভূ.খণ্ডে অসা¤প্রদায়িক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উণ্মেষ ঘটে ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। ষাটের দশকে এই অসা¤প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ আরও সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয় শেখ মুজিবুর রহমানের ৬.দফা দাবিতে। ৬.দফা মূলত পূর্ববাংলার সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বশাসনের দাবি। কিন্তু এই দাবির ভাবাদর্শগত ভিত্তি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিজাতি তত্ত্বের অপপরিচয় থেকে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর জাতিগত আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করেন এবং তাকে লেজেটিমেসি দান করেন।

শেখ মুজিব সেই ১৯৬২ সালেই পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বের করে এনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পের কথা গোপন কমিউনিস্ট নেতাদের জানিয়েছিলেন। এই লক্ষ্য অর্জনের অভিলাষ থেকেই মুজিব ১৯৬৬ সালে ৬.দফা দাবি উত্থাপন করেন। বস্তুত তিনি এটা খুব ভালো করেই জানতেন, পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে ৬.দফা দাবি আদায় করা অসম্ভব। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীও ৬.দফার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পেরে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগের হুমকি দেন।

শেখ মুজিব যে স্বতন্ত্র.জাতি.রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কৃতসংকল্প ছিলেন তা আরও স্পষ্ট হয় যখন তিনি ১৯৬৪ সালে সম্ভাব্য আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে গোপনে আগরতলা যান। 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব গং' মামলাটিকে আমরা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা হিসেবে আখ্যায়িত করি বটে, তবে এই মামলাটি ভিত্তিহীন ছিল না। শেখ মুজিবের আগরতলা সফর, এই মামলার আসামি বাঙালি সামরিক অফিসারদের বিদ্রোহী সংগঠনে গোপন তৎপরতা এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ইত্যাদি ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

শেখ মুজিবের দূরদর্শিতা এখানে যে, তিনি আকস্মিকভাবে স্বাধীন বাংলার কথা ঘোষণা না করে ধীরে ধীরে জমি তৈরি করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে রাজনৈতিক ভাষা দেন ৬.দফা দাবিতে। ৬.দফায় 'লাহোর প্রস্তাবের

ভিত্তিতে' স্বশাসনের কথা বলা হয় গণচেতনার স্তর এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগকে কিছুটা ভোঁতা করে দেওয়ার কৌশল হিসেবে। 'লাহোর প্রস্তাব' এবং 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' যে পরস্পর বিরোধী এ কথাটা বঙ্গবন্ধুর না বোঝার কারণ ছিল না।

বঙ্গবন্ধু তার বাঙালির স্বতন্ত্র জাতি.রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তাকে সর্বজনীন করে তোলার জন্য বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা অসা¤প্রদায়িক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধে জাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেন। 'আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা' এই কথাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার অনেক আগে থেকেই তিনি স্বোচ্চার কণ্ঠে প্রচার করতে থাকেন। ৬.দফা আন্দোলনকালে পদ্মা.মেঘনা.যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা, 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' এবং 'জয় বাংলা' ধ্বনি স্লোগান মাত্র ছিল না। এসব উচ্চারণের ভেতর দিয়ে বাঙালির মানসলোককে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বপ্নে মাতোয়ারা করে তোলা হয়েছিল।

বাষট্টির সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬৪.এর ছাত্র আন্দোলন, সা¤প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ, ৬.দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, '৭০.এর নির্বাচন এবং '৭১.এর অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির ভেতর দিয়ে একদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা যেমন শাণিত ও দৃঢ়মূল হয়েছে, অন্যদিকে মানুষের অভিজ্ঞতাই তাদের স্বতন্ত্র জাতি.রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনিবার্যতার দিকে বিমূর্ত ইচ্ছা ও স্বপ্নগুলোকে মূর্ত.জীবন্ত করে তুলেছেন। ১৯৭১.এর ৭ মার্চের ঘোষণায় যেমন তা সুস্পষ্ট হয়েছে। তেমনি ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা তাকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

অতপর দীর্ঘ নয় মাসের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সামরিক ট্রাইব্যুনাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রায় ঘোষণা করে। রায় কার্যকর করতে লায়ালপুর জেল থেকে তাকে মিয়ানওয়ালি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তারই চোখের সামনে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের দিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্য কবর খোঁড়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর লজ্জাজনক পরাজয় এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক চাপের কারণে ইয়াহিয়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় পাননি। ইয়াহিয়া ক্ষমতাচ্যুত হন। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুকে মিয়ানওয়ালি জেল থেকে রাওয়ালপিন্ডির সিহালা গেস্ট হাউসে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর ভূট্টো আকস্মিকভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু তখনও জানেন না, 'বাংলাদেশ স্বাধীন' হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে। অথবা তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। বস্তুত ভুট্টোই তাঁকে প্রথম এসব খবর দেন। ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার এবং পাকিস্তানের ক্ষমতাগ্রহণের অনুরোধ জানান। স্বভাবতই তিনি বঙ্গবন্ধুর দিক থেকে সাড়া না পেয়ে সব শেষে বলেন, 'মুজিব ভাই, আমাদের কি এক সঙ্গে বসবাসের কোনও সম্ভাবনাই নেই?' বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে বলেন, আমি এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারবো না। আমি আমার জনগণের মধ্যে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলার পর, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

৭ জানুয়ারি, ১৯৭২ সিহালা গেস্ট হাউসে বন্দি বঙ্গবন্দুর সঙ্গে ভুট্টো শেষবারের মতো দেখা করেন। শেষ দিনও ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে কাতর অনুনয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে একটা ◌ink রাখার কথা পুনরুত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু আগের মতোই জবাব দেন। ভুট্টো ওই দিনই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে কথা বলেন। ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বদেশের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান থেকে রওনা করেন। ভুট্টো মন্তব্য করেন 'পাখি উড়ে

গেছে।'

পরের কথাও সবার জানা। লন্ডন, দিল্লি হয়ে বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি অপরাহ্ণ আড়াইটায় ঢাকা বিমানবন্দরে স্বদেশের মাটি স্পর্শ করেন। আবেগে, আনন্দে উদ্বেলিত বাঙালি জাতি সে দিন তাকে যে বীরোচিত সংবর্ধনা জানায় ইতিহাসে তার কোনও তুলনা নেই। বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত উত্তাল জনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে তিনি যখন সংবর্ধনাস্থলে পৌঁছান সূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। রেসকোর্সের ভাষণে আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে সিহালা গেস্ট হাউসে দেওয়া ভুট্টোর প্রস্তাবের জবাব দেন। তিনি বলেন, 'ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সঙ্গে আর না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ... আমরা স্বাধীন, এটা মেনে নিন। আপনারা স্বাধীনভাবে থাকুন।' এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা (Concept) প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর এই রাষ্ট্রচিন্তা সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতি শীর্ষক ৮ অনুচ্ছেদ ও ধর্মভিত্তিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা সম্পর্কিত ৩৮ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়। 'লাহোর প্রস্তাবের' আনুষ্ঠানিক সমাধি রচিত হয়। বাঙালি জাতিসত্তার সুস্পষ্ট পরিচয়, বাঙালির প্রথম জাতি.রাষ্ট্রটির সেক্যুলার গণতান্ত্রিক চরিত্র বৈশিষ্ট্যও নির্ধারিত হয়। বস্তুত আমাদের সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের এটাই সবচেয়ে বড়ো অর্জন। বিএনপি.জামাত জোটের রাহুগ্রাসে এবং জঙ্গি মৌলবাদী উত্থানের মুখে সে অর্জনটি আমরা এখন খোয়াতে বসেছি।

০৬.০১.০৬

নূহ.উল.আলম লেনিন: রাজনীতিক ও কলাম লেখক।

The Daily Ajkerkagoj : Khola Hawa